দৈনিক খবর

৭৫

তারিখ 14 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬-৭

১৪

আত্মিক নেতৃত্ব আসুক শিক্ষকদের তরফ হতে

॥ সন্তোষ গুপ্ত ॥

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনের কাফেটেরিয়ায় গত সিনেট নির্বাচন উপলক্ষে গঠিত সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের একটি ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়।

অবশ্য ঈদ পুনর্মিলনীর নামে এ চা-চক্রের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের যারা সমাজ জীবনে কিছু অবদান রাখেন বা রাখতে পারেন তাদের নিকট গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা এবং এর কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাদের সহায়তা গ্রহণ।

তারা এ প্রয়োজন কেন অনুভব করলেন, এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত।

গত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত বিজয় একটা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তা হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। কাজটা অনেকেই সহজ মনে করেছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ সচেতন ছিল যে কাজটা সহজ নয়।

গণতন্ত্রকে সাধারণভাবে যারা রাজনৈতিক দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন, তারা ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা শাসক পরিবর্তনের মধ্যেই শুধু গণতন্ত্রের কার্যকারিতা দেখেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে তিন বছর পর দেখা গেলো যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ক্রমাগত নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চলছে।

পাকিস্তান আমলে গণতন্ত্র সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ছিল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনকে ব্যবহার। আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান। গণতন্ত্রের এটাই মূল কথা। দ্বিজাতিতত্ত্ব এসেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। অথচ এটা যে অবাস্তব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ সাহেবের উক্তি তার পক্ষে বড় প্রমাণ। তিনি বলেছিলেন যে, এখন থেকে হিন্দু হিন্দু নয়, মুসলমান মুসলমান নয়, তারা সবাই পাকিস্তানী। তার এই উক্তি সত্ত্বেও পাকিস্তান কখনোই ধর্মভিত্তিক জাতি সত্তার সংজ্ঞা ত্যাগ করেনি। পাকিস্তানীরা যে বিভিন্ন জাতির একটি রাষ্ট্র- এ কথা জিন্নাহ সাহেবও মেনে নেননি। তার এ ধরনের উক্তিই তার প্রমাণ।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শকে মেনে নেয়নি বলেই বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বাঙ্গালী জাতীয়তা এবং সেক্যুলার রাজনীতির আদর্শেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর স্বাধীন বাংলাদেশকে তার আদর্শ এবং লক্ষ্য থেকে সরিয়ে পাকিস্তানী আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমানয়ে সামনে নিয়ে আসার চক্রান্ত শুরু হয়, সামরিক শাসনামলে সংবিধানের মূল নীতিগুলো একে একে পরিত্যক্ত হয়।

বাঙ্গালী জাতিকে রাতারাতি বাংলাদেশী জাতি হিসেবে ঘোষণা করলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইতিহাস বিকৃতির পথ ধরলেন তিনি। তার গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিএনপি) জিয়ার প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদ ও ইতিহাস বিকৃতিকে সম্বল করে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়।

তারপর জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন। তার মৃত্যুর দশ মাসের পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করলেন।

এরশাদ ক্ষমতায় এসে ৯ বছর ধরে জিয়ার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দল এরশাদের স্বৈরশাসন উৎখাতের জন্য আন্দোলন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু বিরোধী দলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল।

একশ্রেণীর রাজনীতিকরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগে যে স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলোর পুনঃ প্রতিষ্ঠাও অপরিহার্য তার ওপর তেমন গুরুত্ব দেননি। ফলে স্বৈরশাসন উৎখাত হলো। শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন হলো। নির্বাচনের সময় সাম্প্রদায়িক প্রচারণা পরোক্ষভাবে বিএনপি'র মঞ্চ থেকে চালানো হলো। তিনটি রাজনৈতিক জোটের অন্যতম ছিল বিএনপি। অথচ সাম্প্রদায়িকতা যে গণতন্ত্রের পরিপন্থী এবং তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে এ কথাটা আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য দল বলিষ্ঠভাবে কখনই উচ্চকণ্ঠে বলেনি। তার একটা অন্যতম কারণ ছিল, মৌলবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর মতোই দক্ষিণপন্থী বিএনপি'র নির্বাচনী প্রচারণার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ। তারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেছে এ কারণেই যে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একমাত্র আওয়ামী লীগ দলই ছিল অন্যতম বৃহৎ দল। নির্বাচনে আটদলীয় জোট শিথিল ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

স্বাভাবিকভাবেই বিএনপি সরকার গঠন করে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করার কারণে বিএনপি জামায়াত-ই-ইসলামীর সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্যোগে গঠিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ জাতীয় মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তাবোধ করে। গত সিনেট নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ সিনেটে ৪টি আসনে জয়ী হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এবং পাকিস্তানী আমলে গণআন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছে সেখানে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় কোথায় পৌঁছেছে। এটা উপলব্ধি করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এগিয়ে এসেছেন শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারা ও চেতনা এবং নতুন প্রজন্মকে মূল ধারার সংগে সংযুক্ত করার মহান লক্ষ্যে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রধান টার্গেট। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে তারা ছাত্র ও শিক্ষক হত্যা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে তাদের এ দেশীয় দোসররা হানাদার বাহিনীর নীলনকশা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ডাক্তারদের হত্যা করে।

সেই দিনগুলোকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় সহযোগীদের সংগে হাত মিলিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানোর তাগিদ অনুভব করেছে।

ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে চা-চক্র শুধু নিজেদের মধ্যে হালকা আলাপ-আলোচনা না করে তারা স্থির করলেন যে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অপরিহার্য এবং এ দায়িত্ব পালন করতে তাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

ডঃ মাহতাব উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সভাটি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন এটা জাতীয় পথ নির্দেশের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসই একমাত্র শত্রু নয়। শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীই একটি জাতিকে গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে।

বাংলাদেশের আদর্শে যারা বিশ্বাস করে না, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা এটা প্রচার করতে থাকে। দেখা গেল বিএনপি সেই অভিমতের সমর্থক। আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা তৃতীয় ঝড়ের কথা বলেন। তাদের যুক্তি হলো সাধারণ মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বোঝে না বলে তাদের ভিতরে বিভ্রান্তি ছড়ানো সহজ হয়েছে। তাদের কথার মূল লক্ষ্য হলো যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটা বুঝে-শুনে করেননি। ভারতের পরামর্শে অসময়ে এ ধরনের কথাবার্তা বলে ঠিক করেননি। অর্থাৎ তাদের পরোক্ষ সমর্থন মৌলবাদীদের প্রতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশনা বিভাগে একজন শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি তাই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসরকে সমর্থন করেছে।

অশিক্ষা ও কুসংস্কার আমাদের ধর্মমোহকে লালন করেছে। ধর্মবুদ্ধি যখন সংকীর্ণতার শিকার হয়, তখন তা মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়। কারণ এটা তখন ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধ্যান-ধারণাকে ধর্ম হিসেবে সাধারণ লোক দেখে থাকে।

আমাদের সমাজ জীবনে এই ধর্মগত অবস্থাটার মূল নির্ণয় করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাইরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশেই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারদিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সংগে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।"

এ কথায় কেউ আপত্তি করতে পারে। হিন্দু বলছে যত্র জীব তত্র শিব। অর্থাৎ যেখানে প্রাণী আছে সেখানেই ঈশ্বর আছে। কিন্তু প্রথাটা ক্রমাগত অন্যকে দূরে ঠেলে রেখে নিজের শুচিতা বজায়, জাতপাত বিচার তো তারই পরিণতি। আর মুসলমান তার ধর্মের গণ্ডির বাইরে অবস্থিত অন্যদের খুবই আলাদা করে দেখে। তবে তাদের প্রবলভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, গ্রহণ করে উদারভাবে। তারপর নিজেদের গণ্ডিতে আটক করার মধ্যে সার্থকতা খোঁজে। এই সামাজিক প্রথা যে ঠিক ধর্মানুমোদিত- এ কথা কেউ বলবে না। কিন্তু রাজনীতিতে এটাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা সম্প্রদায়গত বিভেদ আরো তীব্র করে তুলেছে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধেই এ দেশে আমরা পাকিস্তান আমলে লড়াই করেছি। এটা আত্মিক সংগ্রাম। বাইরের সংগে তার যোগ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তাই রাজনীতিকে সুস্থ করতে হলে আত্মিক সংগ্রামের নেতৃত্বকে মজবুত করতে হয়। আমরা ভেবেছিলাম এক সাগর রক্ত দিয়ে এই ভিতটাও বোধ হয় যথেষ্ট শক্ত করেছি। আজ প্রতিকূল অবস্থায় শিক্ষকগণ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেন যে, মনোজগতের পরিবর্তনের পথে অশিক্ষা ও কুসংস্কারই একমাত্র বাধা নয়। উচ্ছিষ্টভোজী বুদ্ধিজীবীরা অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অচলায়তনের মধ্যে বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু তারা এটাকে একটা প্রগতির আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে। শ্রেণী আর সমাজের কথা মনে পড়ে আওয়ামী লীগের আচরণ দেখে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে মামুলী উচ্চারণ ছাড়া আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না।

এরূপ পরিস্থিতিতে মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী, মতান্ধতা বিবর্জিত বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। শুধু নিজেরা এগিয়ে আসবেন তা নয়, বর্তমান প্রজন্ম যাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিক্ষকদের যে অধিকার দিয়েছে, তা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রকারান্তরে প্রতিক্রিয়ার শক্তি এটা সূক্ষ্মভাবে প্রচার করতে চায় যে, উক্ত অধ্যাদেশের জন্যই শিক্ষকরা অধ্যাপনা ছেড়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও শিক্ষাদানে অবহেলার পেছনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা ভোগই দায়ী।

এ যেন বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে পাকিস্তান আমলে কত অল্প বেতনে সংসার চালানো যেতো, সেই কথা বলে স্বাধীনতা যে আমাদের কিছু দেইনি একমাত্র পাকিস্তানী দোসরদের সাধারণ ক্ষমা ছাড়া- এ ধরনের উক্তির শামিল। এই উক্তি নির্বোধের নয়। রাজনৈতিক মতলববাজদের উক্তি। এটা যদি পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী লোকের কণ্ঠে শোনা যেতো তাতে ক্ষোভের কারণ ছিল না। কিন্তু প্রগতিশীল বাম বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যখন বলে যে, স্বাধীনতা কিছুই দেয়নি। কারণ শ্রমিকরা অল্প মজুরি পায়, কৃষকরা ঋণভারে জর্জরিত। অথচ এ নীতির জন্য দায়ী গণতন্ত্র উদ্ধারকারীর ছদ্মবেশে স্বৈরশাসকদের কথা তারা বলেন না। তারা শুধু ৯ বছরের স্বৈরশাসন দেখেন। কিন্তু তার ভিত্তিটা সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির গুণগান সেদিনও করেছেন। এখন বিএনপি সরকার সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণের পর তারা বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগী এ ধরনের বুদ্ধিজীবীরা ছাত্রদের কী ধরনের শিক্ষা দিবেন, তা সহজেই বোঝা যায়। এখন তারা আরো উৎসাহ নিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলছেন। সংবিধান সংশোধন লক্ষ্যে বিএনপি আনীত বিলে কিছু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। বিএনপি'র মধ্য থেকেই তার পরিবর্তনের দাবী উঠছে। কিন্তু উৎসাহী সমর্থক বুদ্ধিজীবী ওই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ওই অগণতান্ত্রিক ধারাগুলো বিএনপি সংশোধন করবে বলে আশা করা যায়। এই জনশ্রুতি আবার তাদের বেকায়দায় ফেলেছে।

বেচারারা ভেবেছিলেন যে, বাংলাদেশ তো স্বাধীন হয়নি। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে মাত্র। সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছে। পাকিস্তানী ঐতিহ্য ও আদর্শ ঠিক আছে। বেচারারা জানেন না, খোল নইলচা দুই-ই গেছে। আর এটা যতই উপলব্ধি করেছে ততই আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ বাড়ছে। বুর্জোয়া দল বলে যদি আওয়ামী লীগ বিরোধী হতে হয়, তবে বিএনপি'র ক্ষেত্রেও তো ওই সংজ্ঞা সত্য। আর সেখানে কেন তারা এতো সহনশীল। এ কথার জবাব দেয়ার জন্য তৈরী হতে হবে। সেই জবাবটা গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ তাদের ফোরামের মাধ্যমে তুলে ধরবে এবং দেশময় ছড়িয়ে দেবে।